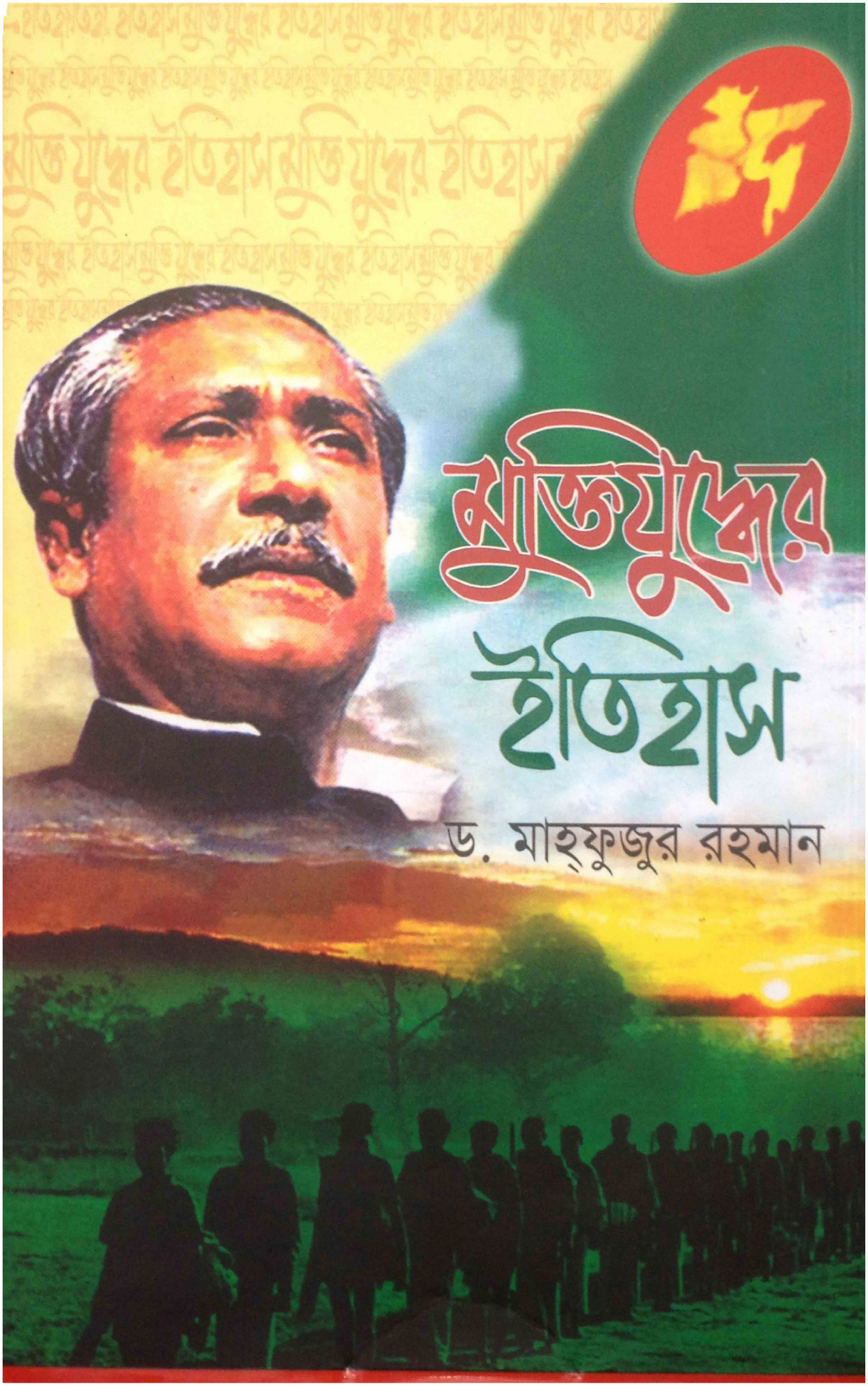
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

স্বত্ব
লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail ittadisutrapat@yahoo.com

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাস লেন, ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১১০০

মূল্য
১৬০ টাকা (ডিভিডিসহ)

ISBN 984 70289 0266 1

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নেয়া
সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুবাদার এই অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতেন। ১৭৪০ সালে সুবাদার সরফরাজ খানের অযোগ্যতার সুযোগে বিহারের শাসক আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন। তার মৃত্যুর পর আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হিসেবে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হন। সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণ এই নবাবের সরলতা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা আর তার আতিশয্যের গোপন শত্রুতাকে পুঁজি করে ইংরেজরা দখল করে নেয় বাংলার মসনদ। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভাগিরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে অনিবার্য এক যুদ্ধে সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ধূর্ত ইংরেজ সেনা লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা

আর এই ঘটনার মধ্য দিয়েই দুশো বছরের জন্য পরাধীনতার আঁধারে ডুবে যায় বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষ।

১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জিন্নাহ্‌র বাড়িতে গান্ধীজি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। এই সংগ্রামে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদের কথা না বললেই নয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি চান নি ভারত ভেঙে হিন্দু মুসলমান ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হয়ে যাক। এজন্যই তিনি মুসলিম লীগের প্রধান নেতা কায়েদ আজম জিন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হন। ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জিন্নাহ্‌র বাড়িতে গিয়ে হাজির হন গান্ধীজি। ভারত-ভাগ ঠেকাতে ১৮ দিন আলোচনা চালান তাঁরা। এতে মুসলিম লীগ নেতারা একটি আলাদা রাষ্ট্রের ব্যাপারে অনড় থাকেন। এরকম অবস্থায় ১৯৪৬ সালের মার্চে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা দিল্লিতে আসেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করতে। তাঁরা গান্ধী-জিন্নাহ্‌সহ বড় বড় নেতার সঙ্গে আলোচনা চালান। এরই ধারাবাহিকতায় সিমলায় ডাকা হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সম্মেলন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আবদুল

ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গাফফার খান, সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো বাঘা বাঘা নেতা সেখানে স্বাধীনতার রূপরেখা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা এক হতে পারেননি। ফলে ১২ই মে ঐ বৈঠক ভেঙে যায়। ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ নেতা কায়দে আজম অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রতিরোধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই কর্মসূচি প্রতিহত করার ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি সহিংস হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালীসহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ছড়িয়ে পড়ে ত্রিপুরা ও পাঞ্জাবেও। দাঙ্গা থামাতে গান্ধীজি প্রথমে অনশন ও তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সফর করতে শুরু করেন। তিনি যান নোয়াখালীতে। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, এ দাঙ্গায় কারোরই কোনো লাভ হবে না। তার আপ্রাণ চেষ্টায় এবং মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ

সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহযোগিতায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এরই মাঝে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে দ্রুত পাল্টাতে থাকে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট। ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে মার্কিন বাহিনীর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে সারা দুনিয়া। এরই মাঝে ২২শে মার্চ ১৯৪৭ ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধীকে তাঁর সরকারি বাসায় আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে স্বাধীন করে দিতে চাচ্ছেন তাঁরা। গান্ধীজি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসও এর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু আরো রক্তক্ষয় এড়াতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে ভারত-ভাগের ব্যাপারে একমত হয়।

শতাধিক বছর ধরে চলা সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনের মুখে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের মধ্য-আগস্টে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হয় পাকিস্তানের। এগারো শো মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের সাত কোটি মানুষ ভেবেছিল পশ্চিমপাকিস্তানের নেতৃত্বাধীন শাসনে তারা মুসলিম পরিচয় সমুন্নত রেখে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু শীঘ্রই বাঙালির স্বপ্নের গুড়ে বালি ঢেলে দেয় পাকিস্তানি শাসকচক্র। প্রথমেই

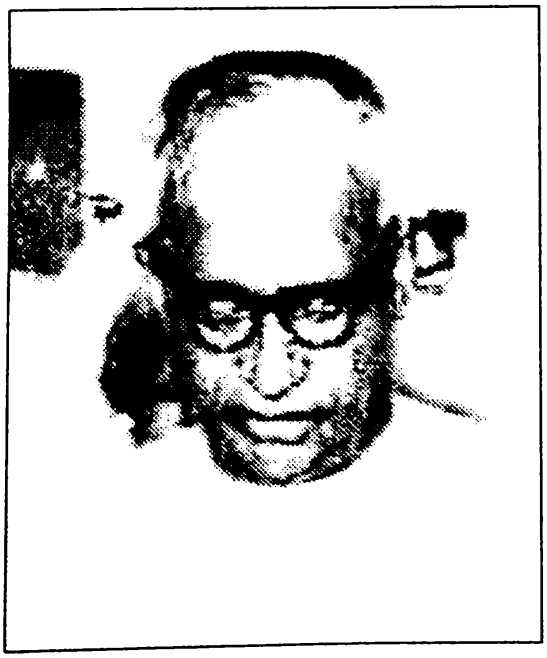

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

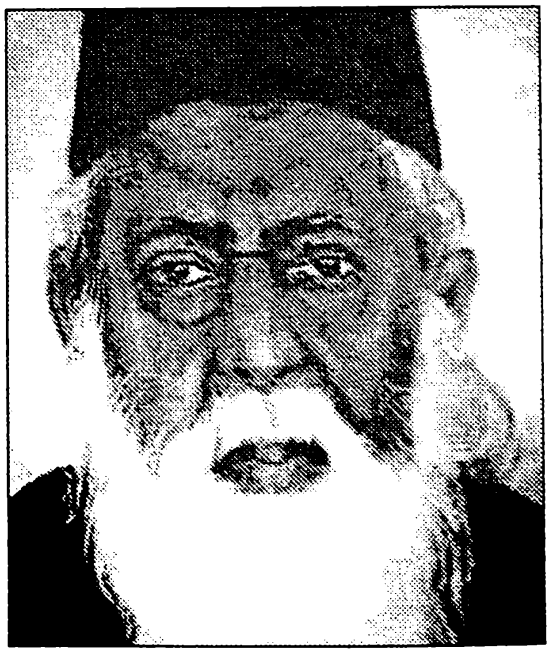

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লর্ড মাউন্ট ব্যাটন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

তার দখল করতে চাইল বাঙালির হাজার বছরের মায়ের মুখের ভাষা বাংলাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ প্রস্তাব করেছিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌সহ এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সে-সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, যিনি মূলত ছিলেন কেন্দ্রীয় পূর্ববাংলার প্রতিনিধি, ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রচলনের চেষ্টা করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি তোলেন শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজুদ্দিন খান এই দাবি নাকচ করে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গোটা বাংলা ফুঁসে ওঠে।

১১ মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্র ডাকা হয় ধর্মঘট। ধর্মঘটীদের দমনে

পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপরে লাঠিচার্জ ও ব্যাপক ধরপাকড় করলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আন্দোলনকারীদের সাথে আট দফার এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাতে বলা হয় উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ১৯৪৮ সালের ২১শে ও ২৪শে মার্চ আলাদা আলাদা সভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়দে আজম জিন্নাহ এই চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এতে আগুনের মতো দ্রুত ভাষা-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকা সফরে এসে তিনিও জিন্নাহ্‌র প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বাঙালির। ৪ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্বপাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। চলতে থাকে লাগাতার আন্দোলন।

২০শে ফেব্রুয়ারি ছিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সব সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। আন্দোলনকারীরা ভাষার দাবি বাস্তবায়নে এই কারফিউ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন।

ভাষা শহীদ বরকত, রফিক ও শফিক

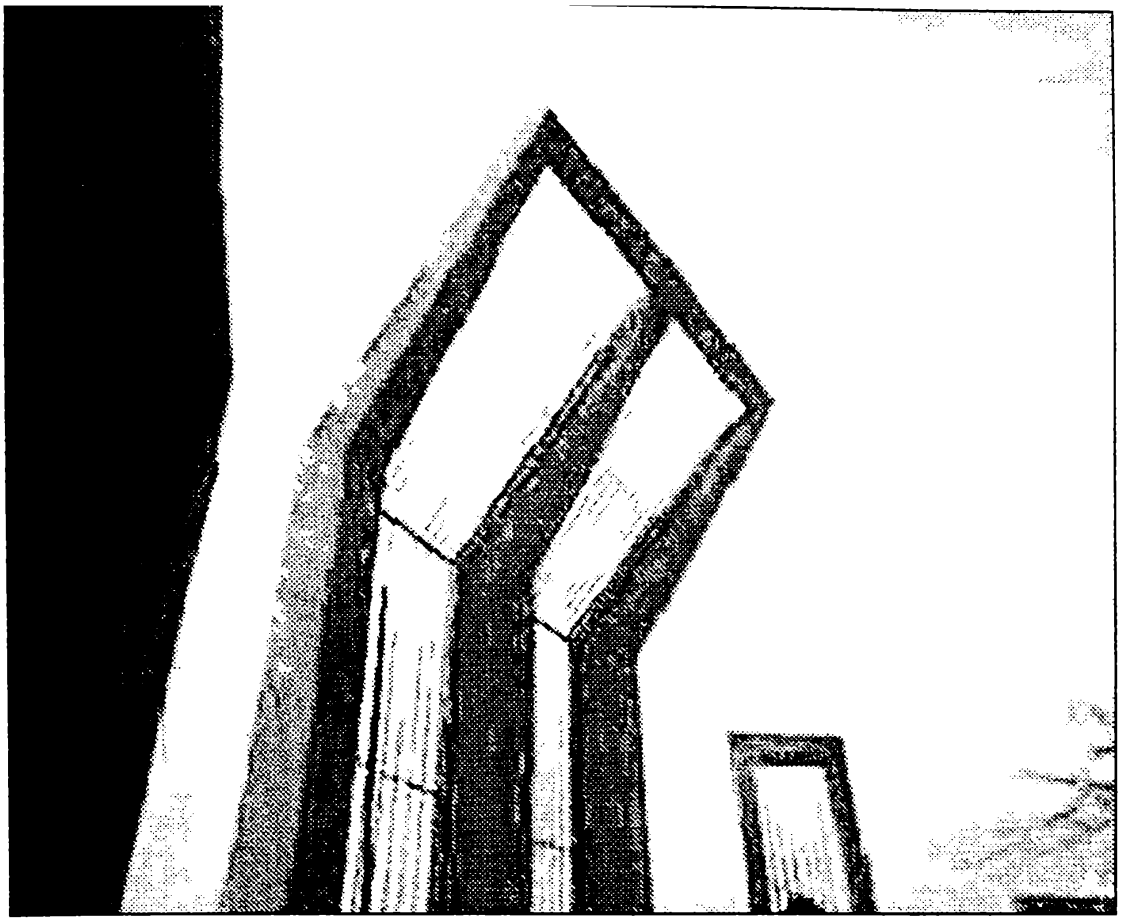

জাতীয় শহীদ মিনার

সেই মোতাবেক বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে মিছিল করে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিকাল ঠিক তিনটা ত্রিশ মিনিট। অতর্কিতে পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে মিছিলের ওপর। আর সাথে সাথে পথে লুটিয়ে পড়েন শফিক, রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেক বীর শহীদ।

২২শে ফেব্রয়ারি এই ঘটনা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তখন প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার অধিকার দিতে চলতি অধিবেশনেই একটি বিল আনে। তবে এই বিল পাস করতে বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, যেদিন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়।

এরই মাঝে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় এসে মুসলিম লীগবিরোধী রাজনীতি শুরু করেন। টগবগে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেককে নিয়ে তিনি ১৯৪৯

সালের ২৩শে জুন গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। ক্রমশ অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন হওয়ার পথে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বাঙালির মনে যে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক বিজয় লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রবল স্রোতে, বলা চলে মুসলিম লীগের রাজনীতি পূর্ববাংলা থেকে ভেসে যায়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার প্রথম দফায় ছিল—বাংলা হবে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা আর দ্বিতীয় দফা ছিল জমিদারীর বিলুপ্তি। কিন্তু ভারতের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। এর পরের কয়েক বছর কেন্দ্রের পছন্দের দুর্বল সরকার দিয়ে পূর্ববাংলা শাসন করার এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি সংবিধান পরিবর্তন, মৌলিক গণতন্ত্র চালুসহ নানা প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন। তাঁর শাসনামলে পূর্বপাকিস্তানে দমন-পীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ট্রাইব্যুনালে জেলখানা থেকে নিয়ে যাওয়ার পথে

পাকিস্তানের রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগ পূর্বপাকিস্তান থেকে গেলেও ঐ যুদ্ধের সময় এই অংশে কোনো প্রতিরক্ষারই ব্যবস্থা করেননি তাঁরা। এর ফলে পূর্বপাকিস্তানিদের মনে এ ধারণা জন্মায় যে পশ্চিমারা আর বাংলার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালের ২৩শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবী' শিরোনামে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এতে প্রতিরক্ষা, রাজস্ব ও মুদ্রাব্যবস্থায় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একটি সাম্য তৈরির মাধ্যমে একটি কার্যকর ফেডারেল স্টেট গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি পূর্ববাংলার জন্য একটি স্বতন্ত্র আধা সামরিক বাহিনী গঠনেরও কথা বলা হয়।

এর পরপরই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে শেখ মুজিবসহ ছয় দফা প্রস্তাবকারীদের ওপর। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁদের সবাইকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে ঢুকানো হয়। পূর্ব বাংলার রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়া হলো।

বিশেষ করে ঐ মামলায় সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে আটক অবস্থায় গুলি করে হত্যা, সার্জেন্ট ফজলুল হককে আহত করা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী হত্যা করায় পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায়।

শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে তখনকার প্রখ্যাত কৌশলী টমাস উইলিয়ামসকে লন্ডন থেকে আনা হয়। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন তখনকার তরুণ ব্যারিস্টার—ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। এই ঘটনায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৯৬৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আকস্মিক-ভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তি দেন এবং নিজে আর পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা দেন।

প্রখ্যাত কৌশলী টমাস উইলিয়ামস

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে আইয়ুববিরোধী জনরোষ

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান চলাকালে রাজপথে শোকার্ত জনতার মিছিল

অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা দিয়ে সর্বাত্মক আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করে, যার মূল কথা ছিল—পূর্ববাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্রনেতা আসাদসহ অনেকে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

এর পরপরই পশ্চিমা শাসকদের নানা শঠতামূলক আলোচনায় ভগ্ন-মনোরথ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব একুশ দফা উত্থাপন করলে

তা পরিণত হয় বাঙালির মুক্তির সনদে। এরকম উত্তাল পরিস্থিতিতে ঊনসত্তরের ২৫শে মার্চ এক বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বঘোষিত লৌহমানব আইয়ুব খান বিদায় নেন। আর মঞ্চে আসেন আরেক সামরিক শাসক আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান। তিনি এসেই শুরু করেন আরেক দফা দমন-পীড়ন। ভয়াবহ নিপীড়ন, নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলার অচিন্তনীয় খারাপ অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের চরম অচল অবস্থার পাশাপাশি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দুর্বার গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেটে যায় সত্তরের দিনগুলো।

সত্তরের ১১ই নভেম্বর ভয়াবহ সাইক্লোনে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর পরও পশ্চিমা শাসকরা কিছু না করায় বাঙালিরা সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে—আর নয় ছদ্মবেশী শত্রুর সাথে বসবাস। তারই রায় দেখা গেল সত্তরের সাতই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে।

পূর্ববাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিই পায় আওয়ামী লীগ। এবং এর মধ্য দিয়ে ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারা। ইয়াহিয়া খানও অভিনন্দন জানান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে।

চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের দৃষ্টিতে হায়েনারূপী ইয়াহিয়া

সত্তরের নির্বাচনে ব্যাপক জয় লাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন একাত্তরের ৩রা জানুয়ারি। সেখানে তিনি একদিকে যেমন সারা দেশের ভোটারদের

'৭০-এর নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, অন্যদিকে তুলে ধরেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁর সরকারের করণীয় সম্পর্কে। সেখানে তিনি দুই পাকিস্তানের ভেতর ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দেন

> 'আজ বাংলাদেশের মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি নাই। আজকে দেখেন রাস্তার পাড়ে পাড়ে বস্তিতে বস্তিতে হাজার হাজার মানুষ ঘর নাই বাড়ি নাই, রাস্তার ওপর পড়ে থাকে। আইয়ুব খানের আমলে খাস জমি বড় বড় ভূমিওয়ালাদের দেওয়া হয়েছে। ঐ ভূমিওয়ালাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে যারা জমিহীন কৃষক তাদের মধ্যে জমি বিলি করা হবে। ভবিষ্যতে খাসল্যান্ড আর বড়লোকদের দেওয়া হবে না, গরিবদের মধ্যে ভাগ করা হবে।
>
> আমি জানি, দেশের মধ্যে বেকার সমস্যা বেড়ে গেছে। কী করবো ভাই, জানি। আপনার আস্থা দিয়েছেন, আপনারা ভোট দিয়েছেন, শতকরা ৯৮টা সিট আমাকে দিয়েছেন, আমি জানি। টাকা কোথায়, পয়সা কোথায়—একদম শেষ করে দিয়েছে। বেকার, সত্তর লক্ষ বেকার আছে এই বাংলাদেশে। এদের জন্য কুটিরশিল্পের মাধ্যমে

এবং কাজের বন্দোবস্ত করে যত তাড়াতাড়ি হয় বেকার সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে এ দেশের মানুষ শেয়াল-কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে না খেয়ে মরবে।

আর একটা কথা বলি আমার রিফ্যুজি ভাইদের কাছে, ২৩ বৎসর পরে এই দেশে আর রিফ্যুজি নাই। আপনারা বাংলাদেশে আছেন, বাঙালি। ২৩ বৎসর পর্যন্ত আজো আমরা রিফ্যুজি ট্যাক্স দিই। সাত লক্ষ রিফ্যুজি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কুচবিহার, কলকাতা থেকে এসেছে, তাদের জন্য আজ পর্যন্ত একটা পয়সা খরচ করা হয় নাই। আজ যারা রিফ্যুজি আছেন, বাংলার মাটির সঙ্গে মিলে যান, বাংলার মাটির সঙ্গে এক হয়ে যান। আপনারা আমাদের ভাই, এই মাতৃভূমিকে গ্রহণ করে নেন। বাঙালি যে অধিকার পাবে আপনারা সেই অধিকার পাবেন। হিন্দু ভাই, খ্রিস্টান ভাই, বৌদ্ধ ভাইদের বলি, তোমাদের উপর এতদিন যে অত্যাচার মাঝে মাঝে হয়েছে, সে আমি জানি। ভবিষ্যতে সে অত্যাচার হবে না। মুসলমানের যে অধিকার এ দেশের হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধেরও সে অধিকার বাংলার মাটিতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইদের বলি, জনগণের খাদেম হতে হলে বড় কর্তা হলে চলবে না, আর গরিবকে না খেয়ে মরতে দেব না। এটা আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে সমস্ত মামলা মকদ্দমা, এখন পর্যন্ত

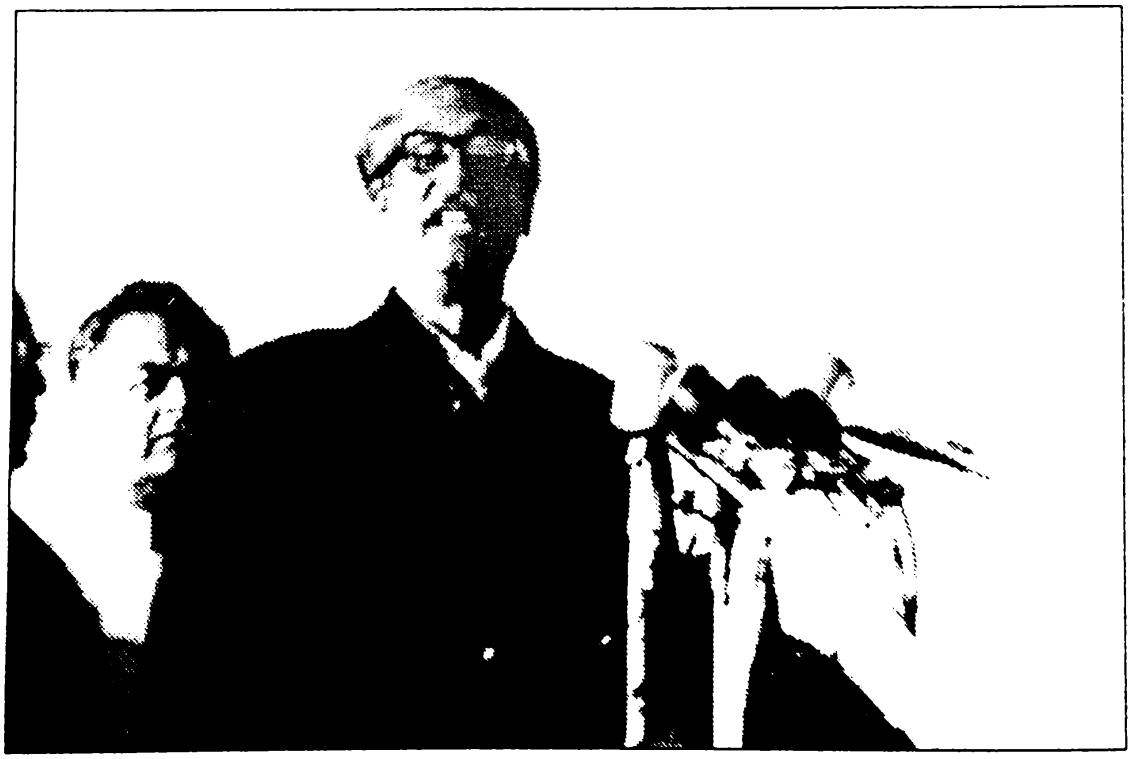

বক্তৃতা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে, ছাত্রদের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আছে এবং যারা বিনা বিচারে বন্দী আছে, সরকারকে অনুরোধ করব, তাদের এই মুহূর্তে মুক্তি দেবার জন্য। আর না হলে কদ্দিন আর রাখবেন, আমরাই তো মুক্তি দেব ইনশাল্লাহ্, সময় আর বেশিদিন নাই।

জয় বাংলা, জয় বাংলা।'

কিন্তু ৮৮ আসন পাওয়া পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে শুরু করেন তিনি। তাঁরা চাইছিলেন না পশ্চিম পাকিস্তানের বাইরের কোনো দল পাকিস্তানের শাসনভার নিক। তাই তাঁরা নানা কূট চাল চালতে শুরু করেন। ভুট্টো প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন, পিপলস পার্টি ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নেয়া হবে না। তাঁর বিরোধিতার কারণে নির্বাচনের প্রায় দুই মাস পর ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু শেষমেশ সেই অধিবেশনও বাতিল করা হলে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের সামনে সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাদের মুক্তির আহ্বান শোনানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না বলেই মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। তাই ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানালেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

'স্বাধীন বাংলা'র পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয় ২ মার্চ ১৯৭১

৭ই মার্চের ভাষণ

"ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ই জুন আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারের দায়িত্বভার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন; আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে, মার্চ মাসে [সভা] হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে,

আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১লা তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন।

৭ই মার্চ ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে, কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার! ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছে, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে

হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তার পরই বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর আগে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ

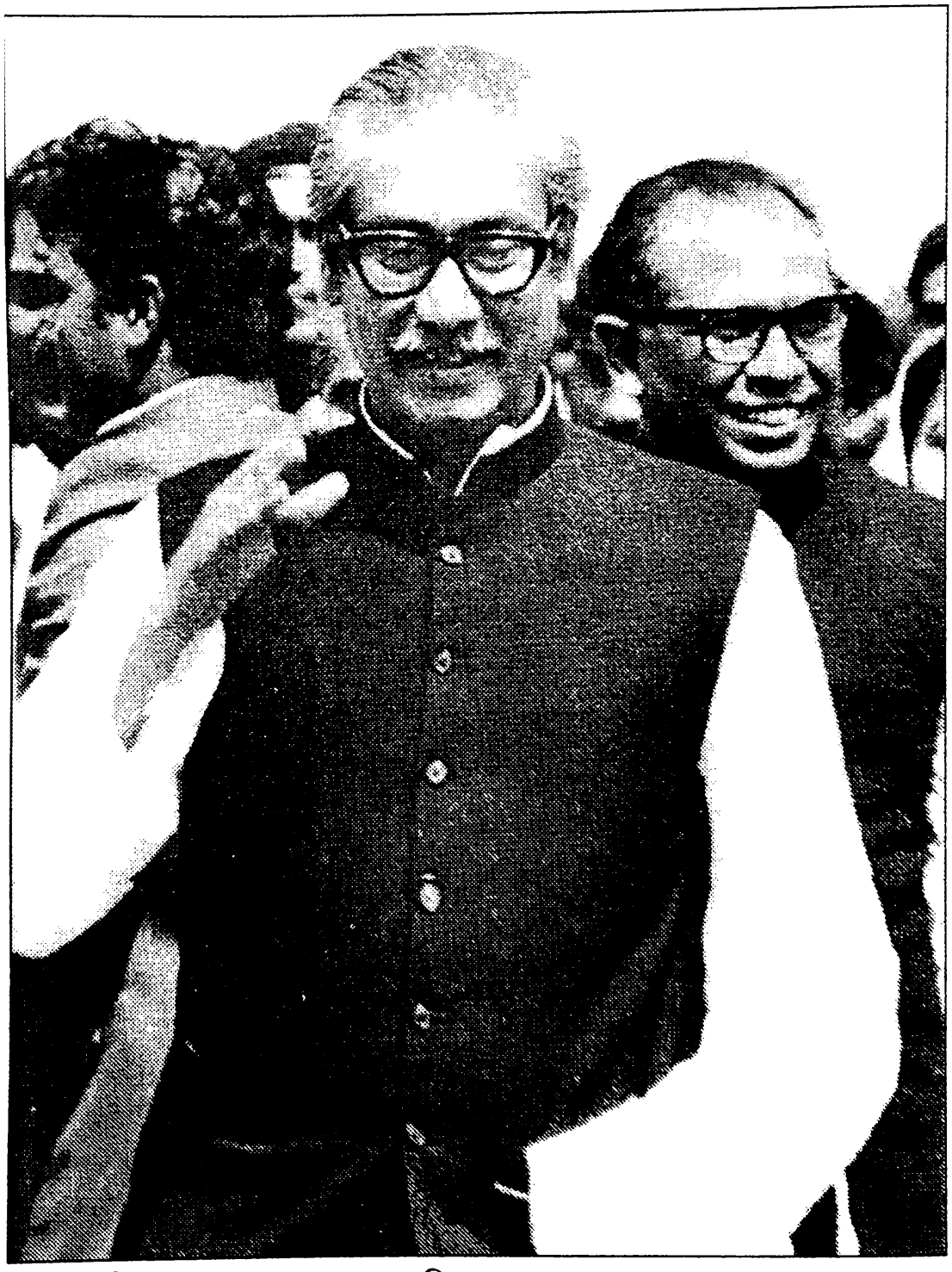

নেতা-কর্মীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো—ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যত দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যাঁরা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেককে শিল্পের মালিক তাঁদের বেতন পৌঁছাইয়া দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবেন না। শোনেন—মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের

কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী

'৭১-এ হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা

লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।"

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখন ইয়াহিয়া সরকার নানা টালবাহানা শুরু করে সে-সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেন তার ক্ষমতার ভিত্তি কত মজবুত ও যৌক্তিক।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তির জন্য এ দেশের মানুষের মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও, পাশপাশি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীও চূড়ান্ত করে বাঙালি নিধনের মহাপরিকল্পনা—অপারেশান সার্চলাইট। আর এই হত্যাকাণ্ড চালাতে শপথ নেয় কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খান।

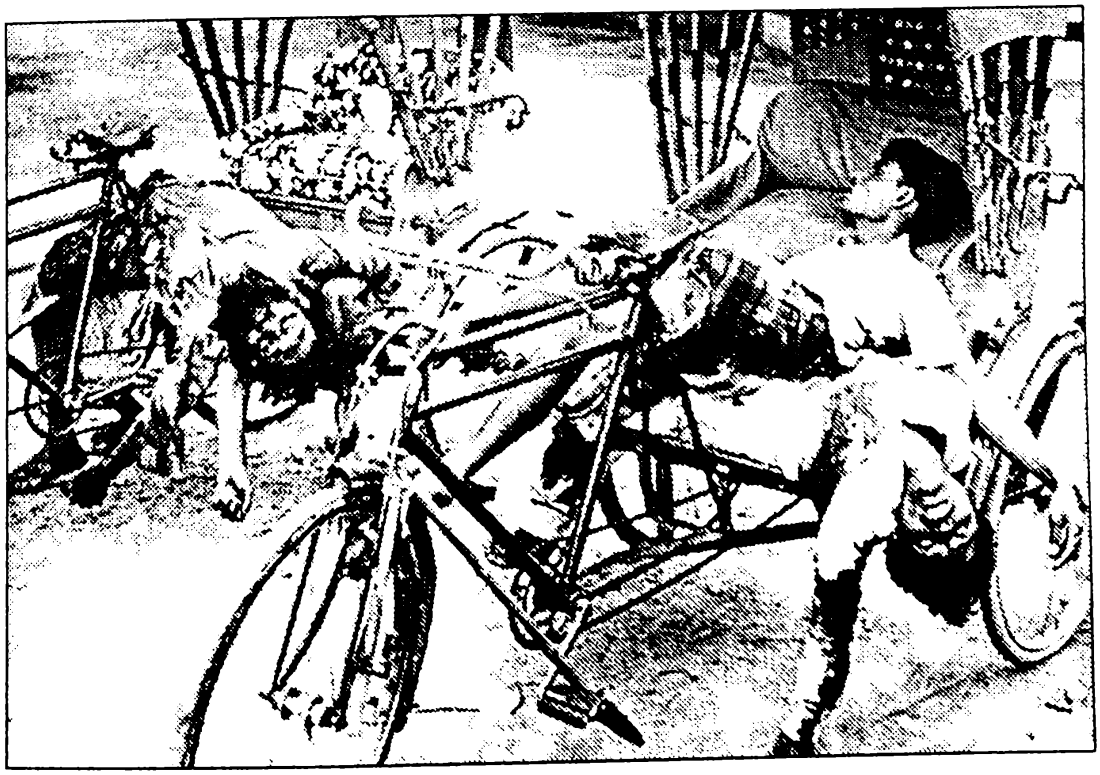

গণহত্যা ১৯৭১

পরিকল্পনা অনুযায়ী পঁচিশে মার্চ বর্বর গণহত্যা চললেও তা সাময়িকভাবে স্তম্ভিত করে দেয় গোটা দেশকে। এক রাতেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সম্প্রতির বাংলাদেশ।

সারা রাত ধরে হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বলতে থাকে পুরো ঢাকা জুড়ে। যেন রাতেও জ্বলে ওঠে দোজখের আগুন। পরের দিন সকালে বিধ্বস্ত ঢাকার চেহারা—এখানে কি কোনো ঝড় হয়েছিল, নাকি গণহত্যা! কে বলবে মানুষ এত নৃশংসভাবে শেষ করে দিতে পারে সবকিছু।

২৫শে মার্চের রাতভর ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার পরদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ তৎকালীন ইন্টারকনটিনেন্টাল হোটেলে অবস্থিত মার্কিন টেলিভিশন এনবিসির এক সাংবাদিক তোলেন জনশূন্য ঢাকার ছবি। যেখানে সাধারণ মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। স্তব্ধতা ভেঙে হুংকার দিয়ে শুধু ছুটে চলেছে পাক হানাদারদের ট্যাংক-লরী। ঢাকার দিগন্ত জুড়ে তখনো দৃশ্যমান আগের রাতে জ্বালিয়ে দেয়া জনপদের দাউদাউ বহ্নিশিখা।

২৯শে মার্চ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেখা যায় কড়া সেনা প্রহরার মধ্যে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এর ভেতরেও চলে জীবনের স্বাভাবিক গতি। শেষ মুহূর্তে চলে কিছু খুঁজে পাওয়ার তৃষ্ণা, কিছু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। জীবন তো এগিয়ে চলবেই।

জগন্নাথ হলেও সকালবেলায় এসে দেখা যায় ভয়াবহ দৃশ্য। শুধু লাশ—নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা—যেন শকুনের ভাগাড়ে পরিণত হয় গোটা বাংলাদেশ। শুধু নগরে-মহানগরে নয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতিটা নদীতেও ভাসতে থাকে লাশ আর লাশ। যেন এক ভাগাড়ে, মহা ভাগাড়ে পরিণত হয় গোটা বাংলাদেশ।

রেসকোর্সের রমনা কালী মন্দির মর্টার মেরে উড়িয়ে দেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা এবং বিদেশী

'৭১-এর বর্বরতা। শকুনের ভাগাড়ে পরিণত হয় গোটা বাংলাদেশ

সাংবাদিকরা পরবর্তী কালে তুলে ধরেন তাদের ভাষণ।

শান্তিপূর্ণ পথে দাবি অর্জিত না হলে কীভাবে তা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করতে হয় তা ভালোই জানতেন বঙ্গবন্ধু। তাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখনই পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক তখনই পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তিনি। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর-এর বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু রাত ঠিক ১২টা ১ মিনিটে ইংরেজি হিসাবে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ইংরেজিতে পাঠানো এই তারবার্তায় তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার সারমর্ম হলো এই :

> 'পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের

মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman
Dacca

Pakistani forces have suddenly attacked EPR Headquarters at Pilkhana and Police Line at Rajarbagh and killed innocent people in the city. Fighting goes on the streets of Dhaka and Chittagong. I appeal to world communities for help. Our freedom fighters are fighting bravely to free their motherland from the clutches of the enemy. My appeal and order to you freedom fighters - in the name of almighty Allah continue to fight till the last drop of blood to free your motherland. You seek the help of police, EPR, Bengal Regiment and Ansars to stand by you in your fight. No compromise with the enemy. Victory is ours. Wipe out the last trace of the enemy from our holy motherland. Convey the message to all patriotic and freedom loving people including Awami League leaders and activists. May Allah bless you. Joy Bangla.

তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর-এর বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু রাত ঠিক ১২টা ১ মিনিটে ইংরেজি হিসাবে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন

পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন, সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

জয়বাংলা।'

২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রমাণ মেলে মার্কিন ডিফেন্স ইন্টিলিজেন্ট এজেন্সির ২৬শে মার্চ ৩টা ৫৫ মিনিটে তৈরি রিপোর্টে। হোয়াইট হাউস সিচ্যুয়েশন রুম থেকে পরবর্তীকালে প্রকাশ পাওয়া এই রিপোর্টে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাংশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেখানকার দশ হাজার আধাসামরিক বাহিনী, ইপিআরের সদস্য, পুলিশ ও সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৩ হাজার নিয়মিত সৈন্যের সাথে লড়াই করছে। রিপোর্টে বলা হয়, পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ সমুদ্র ও আকাশপথের শক্তি বৃদ্ধি করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সফল হবে না বলেও ঐ রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

মেজর জিয়াউর রহমান

বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষণা ও বাঙালি সেনা অফিসারদের ওপর পাঞ্জাবি সেনাদের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আরেক দফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ১৯৭১ সালের

১৯৭১-এ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৭শে মার্চ—যা পরবর্তী কয়েকদিন বারবার রেডিওতে প্রচার করায় প্রায় সকল বাঙালি কাছে পৌঁছে যায়।

বর্ষীয়ান জাতীয়তাবাদী নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও মুক্তি সংগ্রামের ডাক দেন।

তেমন কোনো প্রতিরোধ না থাকলেও যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হলো নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। তবে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা ও মাত্র ২২ দিনের মাথায় বাংলাদেশের মানুষ শুধু পাল্টা প্রস্তুতিই নয়, রীতিমতো সরকার গঠন করে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিরোধ গড়তে ১৭ই এপ্রিল গঠিত হয় প্রবাসী সরকার।

১০ই এপ্রিল আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠার কথা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয়, কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা হবে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী। ততদিনে মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গাকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করে ফেলেছে। কিন্তু এই খবর সারা দুনিয়ায় প্রচার হয়ে গেলে নিরাপত্তার

বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এএইচএম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

কারণেই রাজধানী পরিবর্তন করা হয়।

১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। বৈদ্যনাথতলার নাম পাল্টে রাখা হয় মুজিবনগর। সে অনুসারেই সেই সরকার পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।

সত্তরের নির্বাচনের গণরায়কে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী, এএইচএম কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী এবং এমএজি ওসমানীকে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে

নতুন সরকারের শপথগ্রহণ ও পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। সকাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ক্যাপ্টেন মাহাবুব-এর নেতৃত্বে সশস্ত্রবাহিনীর একটি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রথম গার্ড অব অনার দেয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহাম্মদ আসাদুল হক, শাহাবুদ্দীন আহমেদ সেন্টু ও পিন্টু বিশ্বাস।

প্রচুর সংখ্যক বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই শপথ অনুষ্ঠানে। শপথ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নেতারা বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পরপরই বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মানুষের আকুতি তুলে ধরতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করতে প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এমন সব কথিকা পাঠ করা হয় এবং এমন সব সঙ্গীত প্রচার করা হয়, যা গোটা বাঙালিকে উজ্জীবিত

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১০ জন প্রতিষ্ঠাতা

সৈয়দ আবদুস শাকের, বেলাল মোহাম্মদ, রাশিদুল হোসেন, আমিনুর রহমান ও শারফুজ্জামান

মুস্তফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ আল ফারুক, রেজাউল করীম চৌধুরী, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও কাজী হাবীব উদ্দীন

করে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে। সে-সব গান আজো মানুষের শরীরের রোমকূপকে যেমন শিহরিত করে তেমনি স্মরণ করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধদিনের বাঙালির আন্তরিক এবং অন্তস্তলের অকুতোভয় আকুতিকে, যা সম্ভব করে তুলেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

এই শপথের ডাকে সারা দেয় বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরের মানুষ। শুরু হয় সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি। কিন্তু প্রস্তুতি শুরু হলেও যুদ্ধের ধারণাতীত ভয়াবহতা সেদিন হার মানিয়েছিল বিশ্বের অনেক দেশে এর আগে ঘটে যাওয়া গণহত্যার স্মৃতিকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে ১৯৭১ সালের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের মেডিসন স্কয়ারে এক কনসার্টের আয়োজন করেন সঙ্গীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই কনসার্টের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

ইংরেজিতে গাওয়া জর্জ হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ' গানটির বাংলারূপ

'চোখে প্রগাঢ় বেদনা নিয়ে
বন্ধু আমার এসে বলে তার
অনেক সাহায্য আজ দরকার
যখন মৃত্যুপুরী তারই স্বদেশ
বাংলাদেশ... বাংলাদেশ ॥

বেদনার মর্ম দিয়েও বুঝিনি
পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করিনি
তোমাদের কাছে এই আহ্বান
এগিয়ে এসো বাঁচাতে প্রাণ
নির্বিশেষ
বাংলাদেশ...বাংলাদেশ ॥

মারছে মানুষ নির্বিচারে

মরছে হাজারো অনাহারে
এমন বিশাল ধ্বংসলীলা
কখনো দেখিনি,
বাড়াবে না হাত সহযোগিতার
একটু প্রয়াস অনুভবের
মানবতার এই করুণবেশ
বাংলাদেশ... বাংলাদেশ ॥

ভয়াল এমন বিপর্যয়
বুঝি না আমি কেন যে হয়
চারদিকে ছড়ানো ধ্বংসাবশেষ
দেখিনি এমন দুঃখক্লেশ
বাংলাদেশ... বাংলাদেশ ॥'

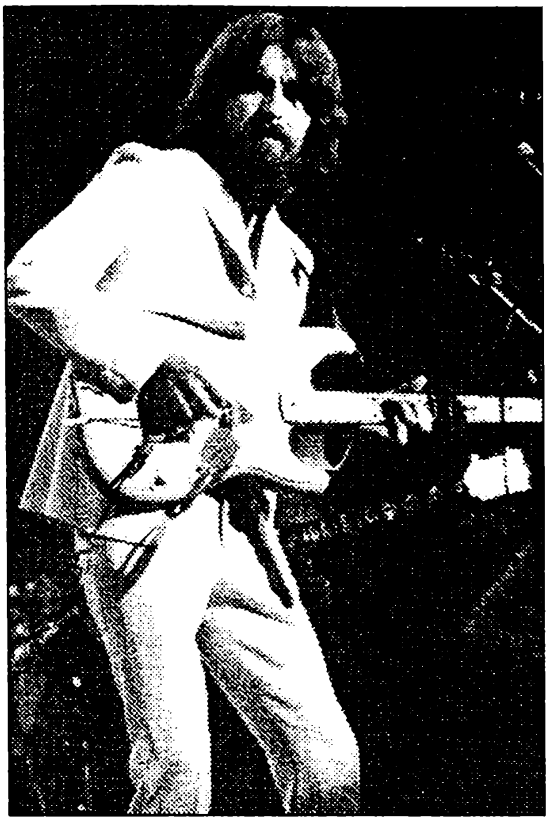

জর্জ হ্যারিসন

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করছেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

শুধু তাই নয়, ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালির জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অল্পদিনেই। ডায়রিয়া ও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বহু শরণার্থী।

ভারত সরকারও প্রায় এক কোটি জীবন বাঁচাতে হয়ে পড়ে দিশেহারা। এ কারণেই প্রায় প্রতিদিনই কলকাতার রাস্তায় দেখা যায়, ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছেন সাহায্যের জন্য। তবে সে সময়ে অর্থের চেয়ে সবচেয়ে বড় সাহায্য—পাশে থাকার আশ্বাস—দিয়ে যাচ্ছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ।

রিফিউজি ক্যাম্পের দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠে বিশ্ববিবেক। শরণার্থীশিবিরের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন মানবসেবার অগ্রদূত মহিয়সী নারী মাদার তেরেসা। তিনি এসব শিবিরের নারকীয় বীভৎসতার তীব্র নিন্দা জানান। বিশ্ববিবেকের প্রতি আহ্বান জানা, ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ভয়ে দেশত্যাগী এসব মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে। কীভাবে একদল মানুষের প্রতি আরেকদল মানুষ এভাবে শোষণ নির্যাতন হত্যার যজ্ঞ চালাতে পারে তা নিয়ে তিনি বিস্ময়

প্রকাশ করেন। শরণার্থীশিবিরের ভয়াবহতা বোঝা যায় 'সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে'র একজন চিকিৎসক ড. সায়মনের এক বক্তব্যে। তিনি অক্টোবর মাসে জানান, পুষ্টির অভাবে এর আগের দু মাসে তিন লাখেরও বেশি শিশু মারা গেছে। যদি ত্বরিত ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে পরের দু মাসে আরো তিন লাখ শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত। জানা যায়, একাত্তরে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আট লাখের বেশি শিশু মারা গিয়েছিল পুষ্টিহীনতায়। মার্কিন সিনেটের শরণার্থী বিষয়ক কমিটির প্রধান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি চেয়েছিলেন পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে অনুমতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি যান পশ্চিম বাংলার শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে। তিনি আঁতকে উঠেন সেখানকার দৃশ্য দেখে। তিনি বিষয়টি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে রিপোর্ট করার পরও রিচার্ডস নিক্সনের সরকার তাতে আমল না দিয়ে বরং পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেন।

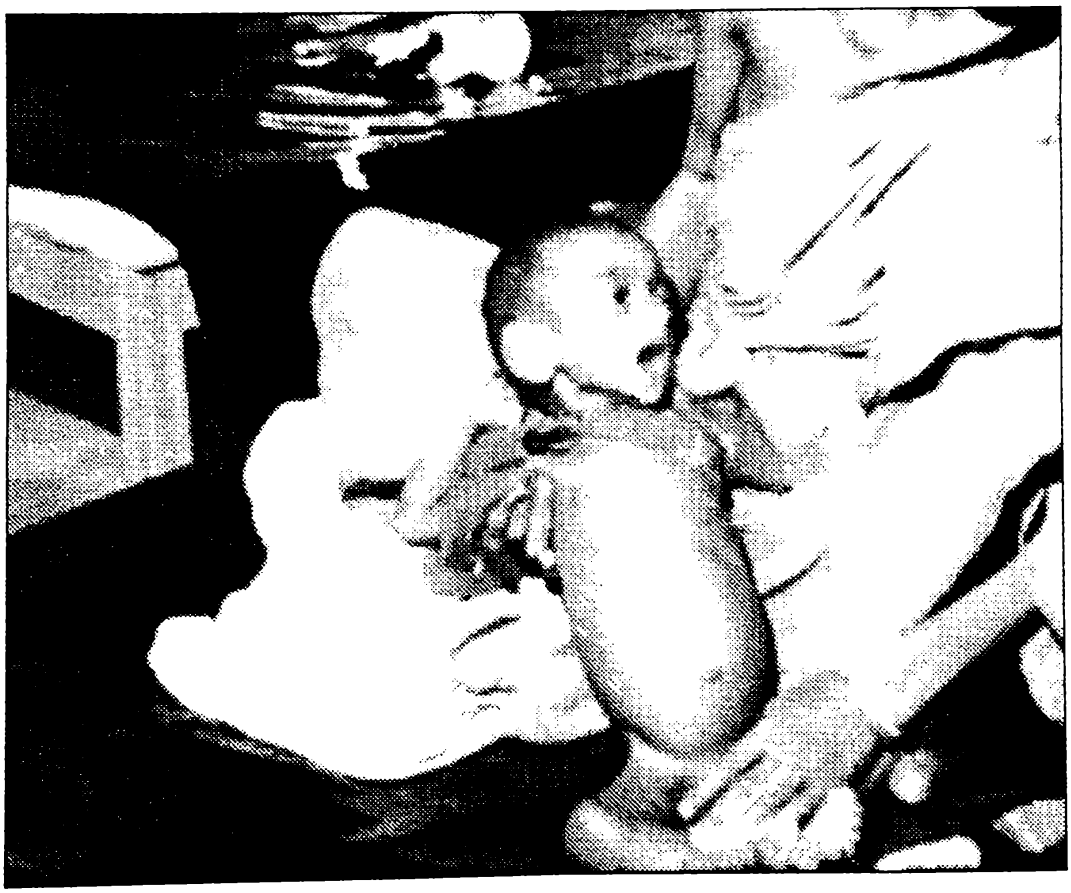

শরণার্থী শিবিরে অসুস্থ শিশু

হানাদার বাহিনীর নৃশংস বর্বরতা

অস্ট্রেলীয় সংসদীয় দলের প্রতিনিধিরাও বিস্মিত হন শরণার্থীশিবিরের অমানবিক পরিস্থিতি দেখে।

একাত্তরের ২৪শে সেপ্টেম্বর বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিক প্রফেসর জন কেনেথ গলব্রেথও আসেন শরণার্থীশিবিরে। তিনি শিউরে উঠেন এখানকার পরিস্থিতি দেখে। তারপরও তিনি মুগ্ধ হন, এত দুঃখকষ্টের পরেও বাঙালির ধৈর্য সাহস আর স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় সংকল্প দেখে। তিনি শরণার্থীদের জন্য সারা বিশ্বের সহানুভূতি কামনা করেন।

১লা অক্টোবর জাপানের পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের চার সদস্য শরণার্থীশিবিরে আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার জাপানের এই সাংসদরা সহজেই বুঝতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা ও বীভৎসতা।

১৮ই অক্টোবর কলকাতায় বসে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ'। এতে ২৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। তাঁরাও শরণার্থীশিবির পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ঐ সম্মেলন থেকে

ঘোষণা আসে যে, বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া দুঃসহ এই মানবিক বিপর্যয় রোধের আর কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই বিপুলসংখ্যক আহত মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত বাঙালি সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন এলাকার হাসপাতালগুলোতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। তাঁদের অপ্রতুল সম্পদ দিয়ে ঐসব হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরা সেবা করতে থাকেন আহতদের। এরকম হাত-কাটা পা-কাটা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পোড়া, গুলিবিদ্ধ আর্ত মানুষের আজাহারিতে ভারি হয়ে পড়েছিল সেদিনের হাসপাতালগুলো।

অজ্ঞাতনামা এই তরুণীটিকে অপহরণ করে শ্লীলতাহানি করে পাকসেনা ও রাজাকার আল-বদররা। তাদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার পর মাথায় গুলি করে তাকে ফেলে রেখে যায় পথের পাশে। ত্রিপুরার একটি হাসপাতালে কয়েকদিনের চিকিৎসার পর তার মৃত্যু হয়। মূলত এভাবেই পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার আল-বদররা

শরণার্থী শিবির

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে বিদেশীরা

চেয়েছিল গোটা বাঙালি জাতিকে নির্যাতন ও মস্তিষ্কশূন্য করে ধ্বংস করতে।

২৯শে অক্টোবর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তাঞ্চল সফরে বের হন। কুষ্টিয়া সংলগ্ন ৫০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা তখন হানাদারমুক্ত। তিনি মুক্তিসেনাদের ঘাঁটিতে যান। তাদের রণকৌশল নিয়ে কথা বলেন। তাদের সাহস যোগান, উৎসাহ দেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাথেও কথা বলেন। তিনি মুক্তাঞ্চল থেকে মূলত বোঝার চেষ্টা করছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের হৃদস্পন্দন কেমন হতে পারে। তাজউদ্দীন বাঙালিদের আন্তরিকতা দেশপ্রেম আর স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হন। রংপুরের পাটগ্রামে মুক্তাঞ্চলে তাঁকে ব্যাপক সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি পুলিশ স্টেশন উদ্বোধন করেন। ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে অবমুক্ত করেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিযুক্ত ডাকটিকেট।

মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য ঘটনা হলো শিশু-কিশোরদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধ যে সত্যিকার গণযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল তা বোঝা যায় কিশোরদের বক্তব্য থেকে। শিশু ও কিশোর গোয়েন্দারা

হানাদার পাকবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প, বাঙ্কার, তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ, দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এবং আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের জানাত। সেই মোতাবেকই রণকৌশল ঠিক করত মুক্তিযোদ্ধারা।

নাম না জানা এই শিশুটি চট্টগ্রামের শালদা নদীর তীরবর্তী এলাকায় মেজর সালেকের কমান্ডিং এলাকাতে পাকবাহিনীর তথ্যপাচারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে।

মেজর সালেক যে অঞ্চলে যুদ্ধ করছিলেন সেই অংশের মূল নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ফোর্সের অন্যতম এক ফোর্সের প্রধান মেজর খালেদ মোশারফ। অমিতসাহসী, বলিষ্ঠ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত অসাধারণ এই যোদ্ধা বর্ণনা করছিলেন তার রণকৌশল।

কিন্তু ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে যাঁরা এই পাকিস্তানিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁদেরই তাঁরা বুঝিয়েছেন সবই মিথ্যে কথা। আর যদি সত্য হয় তাহলে এটা ভারতীয়দের কাজ।

নাম না জানা এই শিশুটি চট্টগ্রামের সালদা নদী তীরবর্তী এলাকায় মেজর সালেকের কমান্ডিং এরিয়ায় পাকবাহিনীর তথ্য পাচারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে

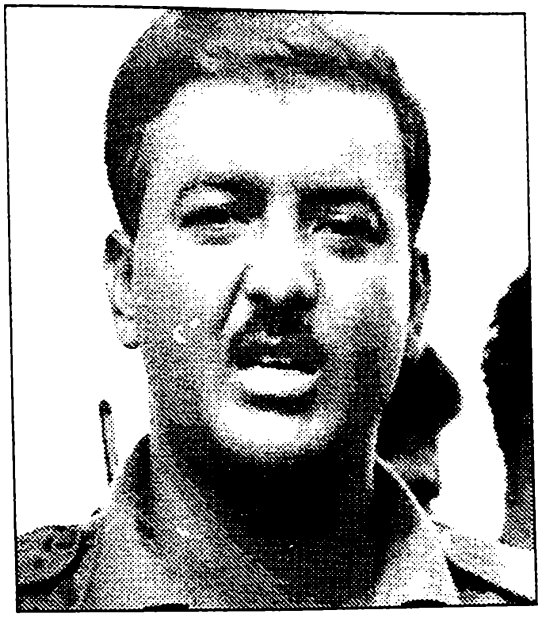

মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর সালেক

তবে পাকিস্তানি ও তাদের দোসর গোলাম আজমরা কতটা সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ অবশ্য সাংবাদিকরা ঠিকই ধরে রাখেন। গোলাম আজমদের সাহায্য নিয়ে আল-বদররা বাংলাদেশে কী তাণ্ডব চালায় তার বর্ণনাই সেদিন দিচ্ছিলেন যশোর রোড ধরে আসা এই বৃদ্ধ।

'পোড়াইছে, লুট কইরেছে, মানে মানুষ একেবারে কাইটে কাইটে দুই ভাগ কইরে দিছে। দুই তিন ভাগ খণ্ড করে দিছে। কবরের মইধ্যে

আল-বদররা বাংলাদেশে কী তাণ্ডব চালায় তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন এই বৃদ্ধ

মাথা জাগাইয়া নাক জাগাইয়া তিন দিন পর্যন্ত থাকতে অইছে। মেয়েছেলে কতকত ছোটছোট বাচ্চা থুইয়া আসছি। তাদের আনতে পারিনি বাবা।'

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজাকার বাহিনীকে বাহ্‌বা দিয়ে বলেন, দেশপ্রেমিকরা এখন সক্রিয়। তাদের মধ্য থেকেই রাতারাতি গঠন করা হয় রাজাকার, আল-বদর ও আল-শাম্‌স্‌ বাহিনী।

এদিকে ঢাকায় বসে পাকিস্তানিরা এসব প্রচারণা চালালেও জুলাই মাসের পরই যুদ্ধের রূপ পাল্টাতে থাকে। ভারতের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবির ঘুরে সর্বহারা মানুষের পাশে থাকার যে আশ্বাস দেন, তা তিনি জানিয়ে দেন সারা বিশ্বকে। অন্যদিকে, মুক্তিসেনারাও সুসংগঠিত হয়ে সীমান্ত এলাকা থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের দিকে।

সীমান্তবর্তী এই এলাকাটা মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুমুক্ত করে আগস্ট মাসে।

রণাঙ্গন পরিদর্শনে তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বাংলার দামাল ছেলেরা

এখানে রৌমারী থানার পুলিশ ক্যাম্প দখল করে সেখানে স্থাপন করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এ সময় বর্ষার মৌসুম চলে আসায় পাকিস্তানিরা পড়ে আরো বেকায়দায়। শুধু তাই নয়, ঢাকায় মুক্তিসেনাদের চোরাগোপ্তা হামলায় তখন দিশেহারা পাক সরকার।

পাকিস্তানিদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদে তাদের তথ্য অধিদপ্তর

পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন মুক্তিসেনারা

উড়িয়ে দেয় দুর্দান্ত বাঙালি গেরিলা দল।

আগস্টের পরই পাকিস্তানিরা বুঝে যায় একার পক্ষে এই পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব নয়। শুরু হয় মিত্রদের দিয়ে কূটনৈতিক যুদ্ধ। তাই ইয়াহিয়ার কণ্ঠে ওঠে পরনিন্দার ঝড়।

বন্ধু পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করতে ষাট ও সত্তর দশকে বিশ্বসেরা কুখ্যাত কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার ভারতে এলেও বুঝতে পারেন অবস্থা বেগতিক। তাই তাদের উদ্যোগেই পাকিস্তান জাতিসংঘে সোচ্চার হয়ে ওঠে ভারতের বিরুদ্ধে। এ সময় সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও না জেনেশুনেই ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। ইয়াহিয়ার মিথ্যাচার আরো বেড়ে যায়। তবে বাঙালির ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেন ছিলেন একাই একশো। তিনি বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়েই বাঙালিদের পক্ষে কথা বলেন।

শুধু তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে বসে থাকেননি ইন্দিরা গান্ধী। নিজ দেশে ও জাতিসংঘেও পাকিস্তানের পাল্টা জবাব দেন তিনি বাংলাদেশের

বাঙালির ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ইন্দিরা গান্ধী যেন ছিলেন একাই একশো

বিশ্ব সফরে বেরিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

মানুষের অবস্থা তুলে ধরে।

তবে এতকিছু সত্ত্বেও দুষ্টের দমন সহজ ছিল না। বাঙালি যোদ্ধারা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিলেও পাকিস্তান ভিন্ন পন্থা বেছে নেয়। ইয়াহিয়া পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বেতারে দাম্ভিক ভাষণ দেন। নভেম্বরের শুরুতে সবকিছু ভারতীয়দের কারসাজি বলে প্রচারণা চালালেও পাকিস্তানিরাই ভারতে আক্রমণ শুরু করে। ত্রিপুরায় নিহত হয় বেশ কয়েকজন ভারতীয়। তবে এর কারণ যে প্রতিহিংসা তা বোঝা যাচ্ছিল।

বাঙালি মুক্তিসেনারা একের পর এক মুক্ত করতে থাকে বাংলাদেশের অঞ্চল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়েন তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্বসফরে। এক এক করে তিনি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেন বাংলাদেশে স্মরণকালের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। তাই বাঙালিরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য লড়াই করছে।

এমন পরিস্থিতিতেই একাত্তরের ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। পাকিস্তানের আক্রমণের জবাব দেয় ভারত খুব দ্রুতই পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে। কিন্তু তখনো পাকিস্তানিরা যা ভুলেও ভাবেনি, তা হলো বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানবে। হয়তো কূটনৈতিক বিজয়ের আশায় এই যুদ্ধ তারা শুরু করেছিল। তার প্রমাণও মেলে পরাজয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সামরিক প্রধান নিয়াজীর কথায়। অথচ এর পরের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

লজ্জা ভুলে জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির আবেদনেও ভেটো দেয় রাশিয়া। এ সময়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া বা বাংলাদেশকে মেনে নিতে ভারতের আহ্বান আরো যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। জাতিসংঘে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়ে বক্তব্যও রাখেন।

শত্রু ঘায়েলে কামান চালাচ্ছেন বাংলার দামাল ছেলেরা

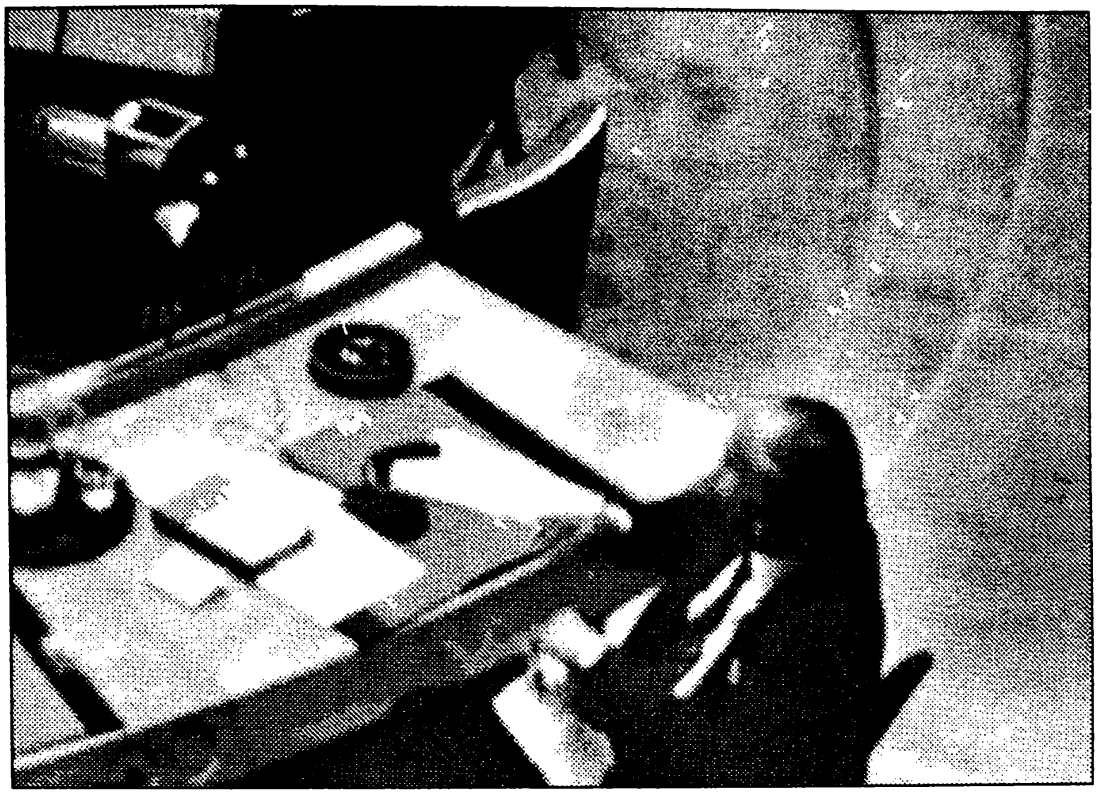

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আত্মসমর্পণ বা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রস্তাবের কাগজ ছিঁড়ে সভা ত্যাগ করেন

এদিকে লড়াই তখন ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে। ভারতের সৈন্যরা একইসঙ্গে আরব সাগর থেকে করাচি বন্দর, পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করে মাত্র চার পাঁচ দিনেই নাজেহাল করে ফেলে পাকিস্তানিদের। শুধু তাই নয়, পশ্চিম সীমান্তে অনেক অঞ্চল চলে যায় ভারতীয়দের দখলে। পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ জয়ের পর ভারতীয় সেনারা সেখানে উল্লাসও করে। ঢাকায় বিমান হামলার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় পাকিস্তানের গভর্নর।

পাকিস্তান না বুঝতে চাইলেও তার মিত্ররা বুঝে যায় পরাজয় আসন্ন, তাই জাতিসংঘে এবার যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বাবা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র আপ্রাণ চেষ্টা করেন প্রস্তাব পাস করতে। কিন্তু তখনো অনড় রাশিয়া, নির্বিকার ভারত। বাংলাদেশ এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে। জাতিসংঘ প্রস্তাব না মেনে প্রমাণ দেয় যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। মহাসচিব উ থান্ট শুধু আবেদন করেন, সাধারণ মানুষের যেন আর প্রাণহানি না ঘটে।

ধীরে ধীরে ঢাকাও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টালি ঢাকায় এসে সে-সব ঘটনার বর্ণনাও দেন।

সেই সময়ে আর কেউ না হলেও, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো লজ্জিত হয়েছিলেন। আর তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আত্মসমর্পণ বা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রস্তাবের কাগজ ছিঁড়ে সভা ত্যাগ করেন। বলেন, তিনি যুদ্ধের পক্ষে। তবে ভুট্টোর ক্ষণিকের দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায় পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানের পরাজয় আর ঢাকায় ভারতীয় ছত্রীসেনাদের আগমনে।

বাংলাদেশে চূড়ান্ত বিজয় যখন দ্বারপ্রান্তে, মুক্তির সূর্য যখন উঠি উঠি করছে, ঠিক সেরকমই একটি সময়ে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী রাজাকার আল-বদররা সম্মিলিতভাবে হত্যা করে এ দেশের সূর্যসন্তানদের। তারা বেছে বেছে চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক—এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে ঢাকার অদূরে মিরপুর রায়েরবাজারে গণহত্যা করে। সেখানে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয় তাঁদের লাশ। তারই বর্ণনা শোনা যায় অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের ভাষ্যে।

পাক সেনাদের বর্বরতা

বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার না হলেও সেই সময়ে নিখোঁজ এ দেশের প্রখ্যাত লেখক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কেন তারা হত্যা করেছিল বুদ্ধিজীবীদের

আমি যা দেখেছি তার মধ্যে সবচে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে, কোনো অপারেশানে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও মানুষদের খুন করার পর মিলিটারী ইউনিট একটা মুভি ক্যামেরা দিয়ে মৃতদেহগুলোর শ্যুটিং করতো। বাড়ি পোড়ানোর পর তারা পুড়ে যাওয়া বাড়িটার শট তুলতো। তারা লোকজনদেরকে বাধ্য করতো বাড়িটার জিনিসপত্র লুট করতে। এরপর তার মুভিক্যামেরা দিয়ে এসব লুটেরাদের শ্যুটিং করতো। আমি পরে জেনেছি যে তারা এসব দৃশ্য সম্পাদনা করে বিশ্ববাসীকে দেখাতো যে বাঙালিরা অবাঙালিদের হত্যা করছে এবং বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই সামরিক বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এটা ছিল পুরোপুরি মিথ্যা।'

মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মস্তিষ্কশূন্য করা যাতে ভবিষ্যতে তারা কিছুতেই উন্নতি করতে না পারে, উঠে দাঁড়াতে না পারে।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

১৬ই ডিসেম্বর নীরবেই পাকিস্তান রাজি হয়ে যায় বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায় রেসকোর্স ময়দানে, ঠিক যেখানে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেখানেই নতমুখে চারদিক থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় নব্বই হাজারেরও বেশি সেনা সদস্য নিয়ে পূর্বাঞ্চলের সেনানায়ক জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।

দিল্লিতে পার্লামেন্ট হাউজে বাংলাদেশের পক্ষে তুমুল করতালির মধ্যে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে।

পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন পৌছালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানান

লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. বি. গিরি

ততক্ষণে বাংলাদেশে উড়তে শুরু করেছে স্বাধীন পতাকা। 'জয় বাংলা'র জয়ধ্বনি চারদিকে।

১৬ই ডিসেম্বরের পর দুই-এক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসেন প্রবাসী সরকারের নেতৃবৃন্দ। যার জন্য যার নামে বাঙালি তার হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ করেছে তিনি তখনো মুক্তি পাননি। এজন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো কয়েক সপ্তাহ। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরার আগে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে আসেন। লন্ডনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। সেখানে হাজির হন সারা দুনিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর আগমনের খবর বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। হাজার হাজার মুজিবভক্ত তাই ভিড় করেন যে হোটেলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন, তার সামনে। বঙ্গবন্ধু তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু কয়েক ঘণ্টা যাত্রাবিরতি করেন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক ও উষ্ণ অভিনন্দন জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. বি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ মন্ত্রিপরিষদ এবং তিন বাহিনীর সকল সদস্য। বঙ্গবন্ধু তাতে আন্তরিক এবং আবেগময় সাড়া প্রদান করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি

সহকর্মী পরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু

আত্মসমর্পণ করছে পাকবাহিনী

ভি. বি. গিরি নিজেই মালা দিয়ে অভিনন্দন জানান, আলিঙ্গন করেন এবং স্বাগত জানান।

দিল্লিতেই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে ভারত সরকার। তিনি করমর্দন করেন ভারতের তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. বি. গিরি বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয় দিল্লিতে। সেখানে হাজার হাজার জনতা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত করে তোলে দিল্লির আকাশ বাতাস। দিল্লির লালকেল্লার সামনে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইন্দিরা গান্ধী বলেন,

'আমাদের অঙ্গীকার আমরা পূরণ করেছি। তাঁর [শেখ মুজিব] শরীর জেলে বন্দী ছিল, কিন্তু তাঁর আত্মাকে কেউ বন্দী করতে পারেনি। তাঁর প্রেরণায় বাংলাদেশের মানুষ সাহসী হয়ে লড়েছে, আজ স্বাধীন হয়েছে। সেই আদর্শের প্রেরণা তিনি আমাদের দিতে এসেছেন। আমি ভারতের জনতাকে তিনটি ওয়াদা করেছিলাম। প্রথমত, যে শরণার্থী এখানে এসেছে, তারা ফিরে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমরা সবকিছু দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করব, বাংলাদেশের মানুষদের সাহায্য করব। এবং তৃতীয়ত, শেখ সাহেবকে আমরা দ্রুত জেল থেকে মুক্ত করে আনব। আমি আমার তিন ওয়াদা পূর্ণ করেছি।'

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু জনতা হৈচৈ শুরু করল। তাঁরা বললেন, তিনি যেন বাংলায় বক্তৃতা রাখেন।

তিনি বললেন :

'আমার ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য ও সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে, আপনারা জানেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার সেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম দুদিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী, আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই, যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে এবং তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে এক কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং রাখার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে সেখানে, তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভাব-অভিযোগ আছে, তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোকরে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারব না। আমরা আশা করি, আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। আমি সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতি আশা করি। এবং এও

আশা করি, দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, সেকুয়েলরিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি, এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্বশান্তির মিল।'

বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে গোটা দিল্লিকেই সাজিয়ে তোলা হয়। দিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক বিদায় জানান রাষ্ট্রপতি ভি.বি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ গোটা দিল্লির মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে যেমন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তেমনি তাঁকে স্বাগত জানাতে আসা, তাঁকে গ্রহণ করতে আসা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাঙালিও আবেগে ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েন। চোখ মুছতে মুছতে বঙ্গবন্ধু তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানান :

'ভাই ও বোনেরা,

আমি প্রথমে স্মরণ করি, আমার বাংলাদেশের ছাত্র-শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী এবং পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দুই-এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে, আমার বাংলা আজ স্বাধীন সার্বভৌম। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না, বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না, আমার বাংলার মানুষকে। ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই সাত কোটির বাংলাদেশে হয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে

ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।

INSTRUMENT OF SURRENDER

www.facebook.com/aap.ullu.ho.pathay.ho

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

পাকবাহিনী বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিল

আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাকবাহিনী প্রধান জেনারেল নিয়াজী

তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি।' কবিগুরু, মিথ্যা কথা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ।

জানতাম না, আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান—একবার মরে, দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু এসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার মা।'

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান ১৯৫৪ সালের ২৮ জুন দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএ (অনার্স) এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ, লন্ডন হতে মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনের উপর অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

দেশীয় পণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানী কার্যে অসামান্য সাফল্যের জন্য সাতবার রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় রপ্তানী ট্রফি অর্জনকারী ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান একজন সফল ব্যবসায়ী। বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল *এটিএন বাংলা* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টিভি জগতের জনক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

এটিএন বাংলা ও *এটিএন নিউজ*-এর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান দেশীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতোমধ্যে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যার মধ্যে– ৩২তম আন্তর্জাতিক টেলিভিশন পুরস্কার এ্যামি অ্যাওয়ার্ড (ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী অব টেলিভিশন, আর্টস এন্ড কমিউনিকেশন), ২৫তম ওয়ার্ল্ড কোয়ালিটি কমিটমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ইউনিসেফ কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ডে অব ব্রডকাস্টিং অ্যাওয়ার্ড, মাদার তেরেসা লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড, মহাত্মা গান্ধী রিসার্স কাউন্সিল অ্যাওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য।

সংগীত ও খেলাধুলায় অনুরাগী ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়ার তৈরির অভিপ্রায়ে আয়োজিত জাতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগীতার তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান *এটিএন বাংলার* মাধ্যমে সর্ব প্রথম কোরআন ও সুন্নাহ'র দাওয়াহ এবং ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন যা বিশ্বের ১৩৬টি দেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

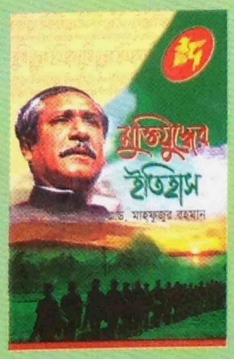

ISBN 984 70289 0266 1

9 847028 902661